# এমওওসি

## অনন্য উন্মুক্ত অনলাইন কোর্স

গোলাপ মুনীর

বিগত কয়েক শতাব্দীতে শ্রেণীকক্ষগুলোর খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। ছাত্রেরা ক্লাসে যোগ দেয়, ক্লাসে নোট নেয় এবং বাড়ির কাজ করে। শিক্ষকেরা ক্লাসে লেকচার দেন, এক সময় পরীক্ষা নেন, ফল প্রকাশ করে ছাত্রদের গ্রেড দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা পরের ক্লাসে উঠে নতুন পাঠ শেখে। বেশিরভাগ ছাত্রেরা, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতরা তাদের বাড়ির কাছের কোনো বিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সেখানে পড়াশোনার মান যা-ই হোক না কেনো, সেটি তাদের বিবেচ্য নয়। বরং বলা ভালো, তা নিয়ে ভাবার সুযোগ বা সঙ্গতি তাদের নেই।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের রুটিনে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। প্রযুক্তি আমাদের শিক্ষার সবকিছুকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছে। বিশ্বের সেরা সেরা কোর্স পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে সবচেয়ে গরিব দেশের ছাত্রদেরও। ছাত্রদের শেখার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পাল্টে দিচ্ছে। কম সংখ্যায় হলেও ক্রমবর্ধমানসংখ্যক স্কুলের ছাত্রেরা এখন স্কুলে কিংবা বাড়িতে বসে অনলাইন লেকচার শোনে। এরপর স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের দেয়া কাজ সম্পন্ন করে। সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে পাঠ নিয়ে আলোচনা করে। কমপিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধারণা বিনিময় করে। এর ফলে এরা নিজেরা নিজেদের মতো করে শ্রেণীর পড়া ও পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে পারে। শিক্ষকেরাও একই ধরনের প্রোগ্রাম ব্যবহার করে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা নেন, ছাত্রদের গ্রেডিং প্রকাশ করেন। স্থানীয় স্কুলেই বাধ্য হয়ে ছাত্রদের পড়তে হবে, সে অবস্থাও এখন আর নেই। নতুন নতুন অনেক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে উন্নত মানের কোর্সের সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের হাতের কাছে। ইন্টারনেট কানেকশন যাদের আছে, তাদের যেকেউ অনলাইনে সে কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছেন।

এ এক ডিজিটাল বিপ্লব। কেনো এ ডিজিটাল বিপ্লব? একটি ব্যাপার হলো, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আগের চেয়ে বেশি চাপের মধ্যে আছে। আগের তুলনায় এখন বেশিসংখ্যক ছাত্র স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে। অপরদিকে বাজেটস্বল্পতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মানসম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য লোক নিয়োগ দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করছেন এর সমাধান দিতে পারে প্রযুক্তি। কিন্তু কারও কারও সংশয় প্রযুক্তি সে অভাব পূরণ করলেও শিক্ষকদের মতো করে শিক্ষার কাজ প্রযুক্তি দিয়ে না-ও হতে পারে। এরপরও সময়ের সাথে ডিজিটাল যুগের নতুন নতুন দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। 'বিগ ডাটা এখন স্কুলে' শিরোনামের এ লেখায় আজ আমরা পরিচিত হব এক ডিজিটাল অধ্যায় তথা অনলাইন কোর্সের সাথে। এ অধ্যায়ের নাম MOOC বা MOOCs, পুরো কথায় Massive Open Online Courses.

### এমওওসি

এর নাম থেকেই স্পষ্ট, এমওওসি একটি উন্মুক্ত অনলাইন কোর্স। ওয়েবের মাধ্যমে এ কোর্স পরিচালিত হয়। এ ওয়েবে প্রবেশ সুবিধা উন্মুক্ত। অসীমসংখ্যক ছাত্র এ কোর্সে অংশ নিতে পারে। প্রচলিত কোর্স ম্যাটেরিয়্যালের বাইরে আরও রয়েছে নানা ভিডিও, পাঠোপকরণ বা রিডিং ম্যাটেরিয়্যাল ও কিছু প্রবলেম সেট। তা ছাড়া এমওওসি'র রয়েছে কতগুলো ইন্টারেকটিভ ইউজার ফোরাম। এ ফোরামগুলোর মাধ্যমে সহায়তা করা হয় ছাত্র, প্রফেসর ও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের (টিএ) একটি কমিউনিটি গড়ে তোলায়। এমওওসি'র কোর্সগুলো হচ্ছে ডিসট্যান্স লার্নিং তথা দূরশিক্ষণের সাম্প্রতিক উন্নয়ন। যদিও প্রথম দিকের এমওওসিতে জোর দেয়া হয়েছিল ওপেন অ্যাক্সেস ফিচারে– যেমন কনটেন্টের ওপেন লাইসেন্সিং, ওপেন স্ট্রাকচার ও কোর্স ম্যাটেরিয়্যাল আর কানেকটিভিজম, রিসোর্সের পুনর্ব্যবহার ও পুনর্মিশ্রণের উন্নয়ন, এমওওসি'র কিছু উল্লেখযোগ্য নবতর ব্যবহার ▸

*প্রযুক্তি আমাদের শিক্ষার সবকিছুকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছে। বিশ্বের সেরা সেরা কোর্স পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে সবচেয়ে গরিব দেশের ছাত্রদেরও। ছাত্রদের শেখার পদ্ধতি প্রক্রিয়া পাল্টে দিচ্ছে। কম সংখ্যায় হলেও ক্রমবর্ধমানসংখ্যক স্কুলের ছাত্রেরা এখন স্কুলে কিংবা বাড়িতে বসে অনলাইন লেকচার শোনে। এরপর স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের দেয়া কাজ সম্পন্ন করে। সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে পাঠ নিয়ে আলোচনা করে। কমপিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধারণা বিনিময় করে। এর ফলে এরা নিজেরা নিজেদের মতো করে শ্রেণীর পড়া ও পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে পারে। নতুন নতুন অনেক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে উন্নত মানের কোর্সের সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের হাতের কাছে। ইন্টারনেট কানেকশন যাদের আছে, তাদের যেকেউ অনলাইনে সে কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছেন। এ এক ডিজিটাল বিপ্লব।*

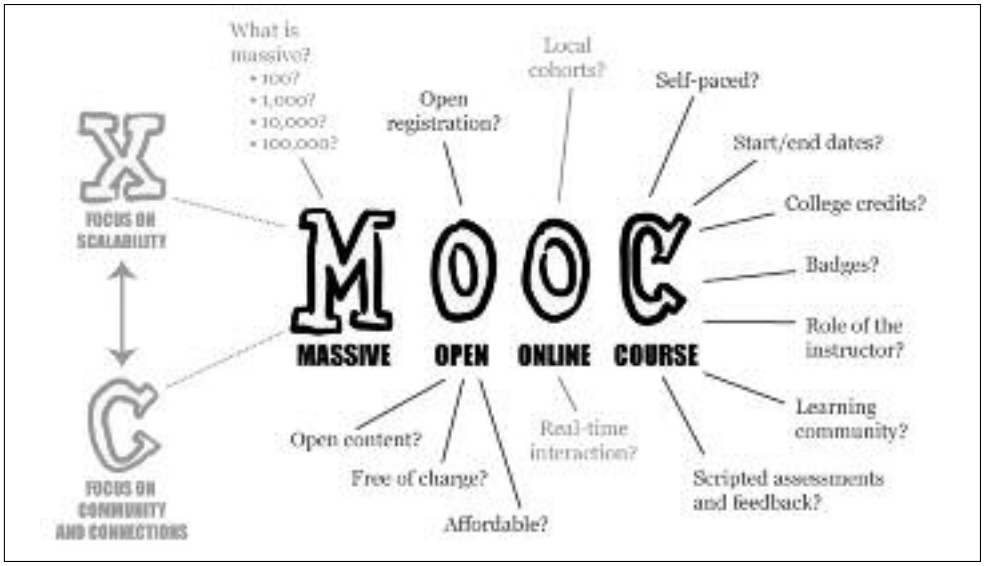

# ‘আর নয় লকস্টেপ লার্নিং’

**সালমান খান,** *ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেনভিত্তিক অলাভজনক অনলাইন শিক্ষা সংগঠন খান অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা*

‘মানুষ যখনই ভার্চুয়াল কিছুর কথা ভাবে, তখনই এরা এর বিপরীতে এর ভৌত প্রতিপক্ষকে (ফিজিক্যাল কাউন্টারপার্ট) দাঁড় করিয়ে একটা ঝামেলার সৃষ্টি করে– যেমন আমাজান বনাম প্রচলিত বইয়ের দোকান, উইকিপিডিয়া বনাম প্রচলিত বিশ্বকোষ। এরা ধরে নেয় সস্তাতর, দ্রুততর ও অধিকতর কার্যকর ভার্চুয়াল কিছু এনে অপসারণ করা হবে ফিজিক্যালকে। তা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল সৃষ্টি করবে ভিন্ন ধরনের বাধা। আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত হবে না ভৌত শ্রেণীকক্ষ বা ফিজিক্যাল ক্লাসরুমগুলোকে সরিয়ে দেয়া। বরং এর পরিবর্তে আমাদের হাতে সুযোগ আছে ভার্চুয়াল ও ফিজিক্যাল ক্লাসের মধ্যে পুরোপুরি সংমিশ্রণ ঘটানো তথা ব্ল্যান্ড করার কথা চিন্তা করা।’

‘আজকের দিনে বেশিরভাগ ক্লাসে ছাত্রেরা ক্লাসরুমে বসে অধ্যাপকদের লেকচার শোনে, নোট নেয়। ক্লাসে ২০ থেকে ৩০০ ছাত্র। ফলে হিউম্যান ইন্টারেকশন খুব কম হয়। ছাত্রেরা তার লেকচার থেকে কতটুকু জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছে, অধ্যাপকেরা তা জানার প্রথম সুযোগ পান পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেয়ার পর যদি অধ্যাপকেরা বুঝতে পারেন, পড়ানো বিষয়ের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে বোঝার ব্যাপারে ঘাটতি রয়েছে, তারপরও পরবর্তী আরও অগ্রসর ধরনের ধারণায় চলে যাওয়া হয়।’

‘ভার্চুয়াল টুলগুলো একটা সুযোগ এনে দিয়েছে এ পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবার। যদি অনলাইনে একটি লেকচার দেয়া হয়, ক্লাসের সময়টা ফ্রি রাখা যায় আলোচনার জন্য এবং আমাদের রয়েছে অনেক অন-ডিমান্ড অ্যাডাপটিভ এক্সারসাইজ ও ডায়াগনস্টিক। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রুশিয়া থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ফ্যাক্টরি মডেল অব্যাহত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, যেখানে ছাত্রদের ঠেলে দেয়া হয় একটি নির্ধারিত লয়ের ছকে। এর বদলে ছাত্রেরা নিজের মতো করে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে তাদের আনুষ্ঠানিক কোর্সের পরও।’

‘আগামী ১০ থেকে ২০ বছর ব্ল্যান্ডেড লার্নিং আমাদের কাছে সুযোগ এনে দেবে লার্নিং থেকে ক্রেডেনশিয়ালকে অর্থাৎ প্রমাণপত্র, প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেট দেয়াকে বিযুক্ত করতে। আজকের দিনে এ উভয় কাজটি করে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। লার্নিং ও ক্রেডেনশিয়ালকে আলাদা করতে পারলে এ উদ্যোগের ফলে যেকোনো জনের পক্ষে উঁচু পর্যায়ের দক্ষতা প্রমাণ করার একটি সুযোগ হাতের নাগালে আসবে। এরা তা শেখার কাজটি সম্পন্ন করুক চাকরি করা অবস্থায়, একটি প্রচলিত স্কুল কিংবা অনলাইন রিসোর্সের মাধ্যমে অথবা এ সবগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে।’

‘সম্ভবত এ বাস্তবতার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে শিক্ষার মান ও সাধারণভাবে অন্যান্য লার্নিং ম্যাটেরিয়্যালের ওপর। প্রচলিত লেকচারার ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকেরা খুব কমই জানেন কীভাবে তাদের কনটেন্ট ব্যবহার হচ্ছে কিংবা জানেন না এটি কার্যকর কি না। সমৃদ্ধ ভৌত শিক্ষা ও অনলাইন টুলের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে কনটেন্ট প্রণেতারা ও অধ্যাপকেরা একটি আপটুডেট ডাটা উপস্থাপন করতে পারেন। এ ‘ব্ল্যান্ডিং লার্নিং’ বাস্তবতায় অধ্যাপকদের ভূমিকার উত্তরণ ঘটিয়ে ভ্যালু চেইনের ওপরে নিয়ে আসা হয়েছে। অধ্যাপকদের সময়ের বেশিরভাগ লেকচার, পরীক্ষা নেয়া ও গ্রেডিংয়ের পেছনে খরচ করার বদলে বরং এখন এরা বেশি সময় পাবেন ছাত্রদের সাথে ইন্টারেক্ট করার জন্য। ছাত্রদের ক্লাসে বসে লেকচার শোনায় সময় ব্যয় করার পরিবর্তে শিক্ষকেরা এখন হবেন ছাত্রদের নিজ উদ্যোগে শেখার ব্যাপারে বিজ্ঞ পরামর্শদাতা। শিক্ষকেরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন ছাত্রদের স্বনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। হ্যাঁ, বিশ্বের দারিদ্রপীড়িত কোনো অঞ্চলের মটিভেটেড ছাত্রের জন্য এ ভার্চুয়াল টুলগুলো ব্যবহারে বাধাগুলো দূর করে অ্যাক্সেসিবিলিটি সমস্যার সমাধান করে আমরা তাদের শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারি। উন্নত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় অনলাইন টুল ব্যবহার বাড়ানো।’

ও এগুলোর কোর্স ম্যাটেরিয়্যালের জন্য ক্লোজড লাইসেন্স, তবে তা ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার রাখার ওপর।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এমওওসি’র কোর্সগুলো হচ্ছে দূরশিক্ষণের সাম্প্রতিক উন্নয়ন। ডিজিটাল যুগের আগে দূরশিক্ষণের আবির্ভাব ঘটেছিল করেসপন্ডেনস কোর্স, ব্রডকাস্ট কোর্স ও প্রাথমিক ধরনের ই-লার্নিং আকারে। ১৮৯০-এর দশকের দিকে সিভিল সার্ভিস টেস্ট ও শর্টহ্যান্ডের মতো বিশেষ বিশেষ বিষয়ের করেসপন্ডেনস কোর্সগুলো রূপ নেয় ডোর-টু-ডোর সেলসম্যানে। ১৯২০-এর দশকে এসে দেখা গেল, ৪০ লাখের মতো আমেরিকান ভর্তি হয় করেসপন্ডেনস কোর্সে। এসব করেসপন্ডেনস কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েকশ’ কর্মমুখী প্রায়োগিক বিষয়ে পড়ার সুযোগ। তখন করেসপন্ডেনস কোর্সের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রচলিত কলেজের ছাত্রসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাদের কোর্স শেষ করার হার ছিল ৩ শতাংশেরও নিচে। ১৯২০-এর দশকে ব্রডকাস্ট রেডিও ছিল নতুন পাওয়া। এর মাধ্যমে যেকোনোসংখ্যক শ্রোতা শেখার সুযোগ পান। ১৯২২ সালে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে এর নিজস্ব রেডিও স্টেশন। পরিকল্পনা ছিল এর মাধ্যমে এর সব কোর্স সম্প্রচার করা। কলম্বিয়া, হার্ভার্ড, ক্যানসাস স্ট্যাট, ওহাইও স্ট্যাট, উইসকনসিন, উটাহ এবং আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ও একই পথ অনুসরণ করে। ছাত্রেরা পাঠ্যবই পড়ে ও রেডিওতে সম্প্রচারিত লেকচার শুনে ডাকযোগে তাদের পরীক্ষার উত্তর পাঠায়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় কোর্স সম্পন্ন করার হার ছিল খুবই নিচু মাত্রার। ১৯৪০-এর দশকে এসে যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও কোর্সের কার্যত বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৫১ সালে অস্ট্রেলীয় ‘স্কুল অব এয়ার’ তাদের ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষে পড়াতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু কিছু স্কুলে ব্যবহার শুরু করে ‘টু-ওয়ে শর্টওয়েব রেডিও’। এর মাধ্যমে সরাসরি ইনস্ট্রাকটারদের প্রশ্ন করার সুযোগ পেত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুভি ব্যবহার করে লাখোজনকে শেখানো হতো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ দেয় টেলিভিডাইজড ক্লাসের, যার সূচনা হয় ১৯৪০-এর দশকে সুইসবিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কিছু ছাত্রকে ক্লোজড সার্কিট ভিডিও অ্যাক্সেস সুবিধা দেয়ার জন্য ১৯৮০-র দশকে ক্লাসগুলোকে সংযুক্ত করে রিমোট ক্যাম্পাসের সাথে। সিবিএস টিভি সিরিজ ১৯৫০ থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত ‘সানরাইজ সেমিস্টার’ সম্প্রচার করে। সিবিএস ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কোর্স ক্রেডিট দেয়। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস জে. ওডোনিল ১৯৯৪ সালে সেন্ট জন অগাস্টিন অব হিপ্পোর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি সেমিনার পাঠ দেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে gopher ও e-mail ব্যবহার করে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ৫০০ জনের মতো লোক এ পাঠে অংশ নেয়। অনেক এমওওসি ব্যবহার করে খান অ্যাকাডেমি উদ্ভাবিত স্ল্যাপি ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিওর ফ্রি আর্কাইভের শর্ট লেকচার ফরম্যাট। চীনে ২০০৩ সালে চালু করা হয় ‘হ্যালো চায়না’। ৪০ লাখ চীনা শিক্ষার্থীকে রেডিও, ওয়েব ও মুঠোফানের মাধ্যমে বিজনেস ডিগ্রি কোর্সে পড়ানোর জন্য এটি চালু করা হয়। যাদের রেডিও ও ইন্টারনেট রয়েছে, তাদের সবার জন্য এ কোর্স উন্মুক্ত। সে বছর ২৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকা ‘হ্যালো চায়না’কে ‘নিউ মিডিয়া ভেঞ্চার’ বলে অভিহিত করে।

প্রথম এমওওসি’র সূচনা হয় ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস (ওইআর) আন্দোলনের মাধ্যমে। এমওওসি পদবাচ্যটি ২০০৮ সালে প্রথম চালু করেন ইউনিভার্সিটি অব প্রিন্স ▸

এডওয়ার্ড আইল্যান্ডের ডেভ কর্মিয়ার এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর টেকনোলজি ইন লিবারেল এডুকেশনের ব্রায়ান আলেক্সান্ডার। এরা তা করেন কানেকটিভিজম অ্যান্ড কানেকটিভ নলেজ (CCK08)-এর প্রতি সাড়া দিয়ে। (CCK08)-এর নেতৃত্ব দেন আলাবাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ সিমেন্স এবং ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের স্টিফেন ডাউনস। এর সব কোর্স কনটেন্ট পাওয়া যায় আরএসএস ফেডের মাধ্যমে। কলাবরেটিভ টুলের মাধ্যমে সব অনলাইন স্টুডেন্ট তাতে অংশ নিতে পারে।

## এমওওসি : বিশ্ব অভিজ্ঞতা

তুজিজা উইতুজি রুয়ান্ডার একটি সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। ক্লাসে সেরা। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান বিবেচনায় তার লেখাপড়ার মান অনেক নিচে। স্কুলে তার ইনস্ট্রাকটরেরা পড়া মুখস্থ করাতেন। বারবার তা পড়িয়ে পড়া গলাধঃকরণ করাতেন। এ স্কুলে ব্যবহারের মতো তার কোনো কমপিউটার ছিল না। এর ফলে তুজিজা উইতুজির ইংরেজি শেখা অপূর্ণ ছিল। ইমপারফেক্ট ইংরেজি নিয়েই চলছিল তার লেখাপড়া। কমপিউটার চালনায় দক্ষ হওয়ার সুযোগ সে পায়নি। সে তার বড় চাচার সাথে কিগালিতে থাকত। তার সঞ্চয় ছিল মাত্র ৭৫ ডলার। গভীর মনোযোগ, কঠোর সাধনা ও সফল হওয়ার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার স্বপ্ন ছিল নাগালের বাইরে। তার সামনে রাতারাতি জীবন পাল্টে দেয়ার মতো কোনো উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পও ছিল না। তার জীবন পাল্টানোর পরীক্ষার নাম Kepler, যার পরিচালনায় ছিল ছোট্ট অলাভজনক সংগঠন 'জেনারেশন রুয়ান্ডা'। এ সংগঠন উদ্যোগ নেয় অনলাইন কোর্স এমওওসি ব্যবহার করে রুয়ান্ডার সেসব তরুণের সেরা মানের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়ার, যেসব তরুণ জন্মেছে সে দেশে ১৯৯৪ সালে ঘটে যাওয়া গণহত্যার সময়ে।

এ কোর্সের প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় গত মার্চে একটি প্রিপাইলট ক্লাসের মাধ্যমে, যার নাম দেয়া হয়েছে 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইন গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ'। এটি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া একটি অনলাইন সুযোগ। এমওওসি প্ল্যাটফরম থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও লেকচার শোনানো হয় এক ডজন ছাত্রছাত্রীকে। এরা কিগালির একটি শ্রেণীকক্ষে যোগ দেয় একটি ছোট্ট সেমিনার ও কোচিং সেশনে। সাথে ছিলেন একজন অনসাইট টিচিং ফেলো। এ ধরনের শিক্ষাকে বলা হয় ব্লেন্ডেড লার্নিং।

উইতুজির মতো একজন ছাত্রী, যে হুতুদের পরিচালিত ৮ লাখ তুতসি হত্যার সময় ছিল একজন শিশু ও যার জীবন বেঁচে গেছে হুতুদের দয়ার ওপর, তার জন্য এটি ছিল এক চমৎকার সুযোগ। গণহত্যার সময় তার পরিবার পালিয়ে যায় প্রথমে বুরুন্ডিতে, এরপর তাঞ্জানিয়ায়, তারপর কেনিয়ায়। উইতুজির কথা : 'তখন আমরা অর্থকড়ি খুইয়েছি, বাড়ি হারিয়েছি, সব হারিয়েছি।'

সে রুয়ান্ডায় ফিরে আসে ১৪ বছর বয়সে। একটি স্কুল থেকে গত বছরের নভেম্বরে সে গ্র্যাজুয়েট হয়। রুয়ান্ডার একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মানহীন শিক্ষার জন্যও বছরে বেতন দিতে হয় ১৫০০ ডলার। এ অর্থ জোগাড় করা উইতুজির পরিবারের জন্য কঠিন। তার মা বেকার। উইতুজির রয়েছে ছোট তিন ভাইবোন। এদের খরচও জোগাতে হয়। একটি সংগঠন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্কলারশিপ জোগাড়ে রুয়ান্ডার শিক্ষার্থীদের সহায়তা জোগায়। সেখানে স্কলারশিপ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর এ সংগঠনের একজন উইতুজিকে কেপলারে যোগ দেয়ার পরামর্শ দেন। এমওওসি ফরম্যাট টেস্ট করার জন্য যে ▸

**৪২.৫০**

কোটি ডলার ভেঞ্চার ক্যাপিটেলিস্টেরা ২০১২ সালে বিনিয়োগ করেছে কে-১২ ক্লাসের উপযোগী নতুন টেকনোলজির জন্য

# 'ভারতের জন্য এক সুযোগ'

**পবন আগরওয়াল,** *ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের উচ্চশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা*

'ডিজিটাল টেকনোলজি ভারতের উচ্চশিক্ষায় নাটকীয় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এক সম্ভাবনাময় উপায়। বিদেশী সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া কোর্সের সাথে সমন্বিত করে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত এমওওসি-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক নতুন মডেল ভারতের উচ্চশিক্ষায় এমন মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে, যা এর আগে সম্ভব ছিল না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুরসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হচ্ছে, আর দিন দিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১০ সালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে চীনের স্থান সবার শীর্ষে। এরপরই রয়েছে ভারত। প্রতিদিন ভারতে ৫ হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। আর প্রতিদিন দশটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের দুয়ার খুলছে। দেশটি এর জিডিপির ৩ শতাংশ ব্যয় করে উচ্চশিক্ষার পেছনে। এ হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। তারপরও তাদের ছাত্রপিছু খরচের পরিমাণ সর্বনিম্নদের মধ্যে। সম্প্রতি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাত্রা আরও বেড়েছে, তখন ছাত্রপিছু ব্যয়ের পরিমাণ আরও কমে গেছে। ফ্যাকাল্টির অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মান কমে গেছে।'

'ভারতকে অবশ্যই উচ্চশিক্ষায় ছাত্রভর্তি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষার মান বজায় রেখে শিক্ষাব্যয়ও কমিয়ে আনতে হবে। এ পরিস্থিতি শুধু ভারতেই নয়, অন্যান্য অনেক দেশেও। কিন্তু ভারতের উচ্চশিক্ষার আকার তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। এদিক থেকে ভারতের চ্যালেঞ্জ ভীতিকর। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল টেকনোলজি, বিশেষ করে এমওওসি'র ব্যাপক ব্যবহার ভারতের জন্য সহায়ক হতে পারে। এর আগেও ভারত অনলাইন ক্লাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব ভারতে খুব একটা পড়েনি। এক দশক আগে 'ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন টেকনোলজি এনহ্যান্সড লার্নিং' নামে সরকারি কর্মসূচির আওতায় ভিডিও ও ওয়েভভিত্তিক কোর্স সরবরাহের জন্য দেশটিতে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। ডেভেলপারেরা তৈরি করেন ৯শ'রও বেশি কোর্স। এগুলো প্রধানত ছিল বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ের কোর্স। প্রতিটি কোর্সের জন্য নির্ধারিত ছিল ৪০টি ইনস্ট্রাকশন আওয়ার। সীমিত ইন্টারেকটিভিটি ও অসম মানের কারণে এসব কোর্স ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।'

'এমওওসি ভারতীয় শিক্ষাবিদদের শিখিয়েছে আরও ভালো ইন্টারেকটিভিটি গড়ে তুলে কীভাবে আরও উন্নততর ও কার্যকর পর্যায়ের লেকচার ছাত্রদের জন্য উপস্থাপন করা যায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি পরিকল্পনা নিয়েছে এমওওসি'র মাধ্যমে হাজার হাজার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের জন্য ডাটা স্ট্রাকচার, প্রোগ্রামিং ও অ্যালগরিদমের ওপর তিনটি বেসিক আইটি কোর্স সৃষ্টির। এসব কোর্সে ক্রেডিট ও ডিগ্রি দেয়া হবে। এটি ভারতের বিপুলসংখ্যক তরুণের কাজে আসবে। এরা টেকনোলজি ব্যবহারে স্বস্তি উপলব্ধি করে। ভারত এমওওসি ব্যবহারে সবচেয়ে আগ্রাসী দেশগুলোর একটি। গত মার্চে কোর্সেরায় নিবন্ধিত ইউজারের সংখ্যা ২৯ লাখ। এর মধ্যে আড়াই লাখই ভারতীয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারতের স্থান।'

'এখনও আমাদের চাহিদা হচ্ছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এমওওসি ব্যবহারে আরও সঠিক মডেল। এ ক্ষেত্রে আমাদের এক দশকের অভিজ্ঞতা ও চমৎকার টেকনোলজি ইকোসিস্টেমের ওপর ভর করে ভারত নিশ্চয় একটা পথ বের করে নিতে পারবে, সে সম্ভাবনাও প্রবল।'

# ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চাবিকাঠি’

**রবার্ট এ. লুইয়ি**, *হার্ভার্ডএক্সের ফ্যাকাল্টি ডিরেক্টর ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকুলার অ্যান্ড সেলুলার বায়োলজির প্রফেসর*

‘এক দশক আগে যখন আমার প্রথম অনলাইন কোর্স পড়াই, তখন আমার ডিপার্টমেন্টে আমি ছিলাম এক অদ্ভুত মানুষ। আমার প্রাইমারি মটিভেশন ছিল এইডস সম্পর্কে জনমনে ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করতে এইচআইভির বায়োলজি বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা। কোর্সটি তৈরি করা হয়েছিল ইন-ক্লাস লেকচারের ভিডিও ক্যাপচারের সমন্বয়ে, যা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার করা হতো। আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ২০১২ সালের মে মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি edX নামের একটি ইনস্টিটিউশনাল পার্টনারশিপ গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। এর লক্ষ্য অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ সম্প্রসারণ করা এবং একই সাথে আমাদের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসের টিচিং ও লার্নিংয়ে পরিবর্তন আনা। অনলাইন টিচিংয়ে ফ্যাকাল্টির আগ্রহ বেড়েছে। যদিও এসব ক্লাস ব্যাপকভাবে ওয়েবে পাওয়ার বিষয় নিয়ে ব্যাপক তর্কবিতর্ক অব্যাহত আছে।’

‘অনলাইন ক্লাস ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়্যাল শেয়ার করা নয়, বরং তা এসব ম্যাটেরিয়্যালের ওপর ভিত্তি করে অনলাইন ক্যাম্পাসের ছাত্রদের ও অনলাইন শ্রোতাদের পড়ানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনও। আমাদের অনেক সহকর্মী অনলাইন কোর্সের ডিজিটাল টুল ব্যবহার করছেন ক্যামব্রিজ ও এমআইটিতে ছাত্রদের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন আনার জন্য। উদাহরণ টেনে বলা যায়, ডেভিড জে. মিলানের কমপিউটার বিজ্ঞানের ইন্ট্রোডাকটরি কোর্সের জন্য তৈরি প্রতিটি ভিডিও টিউটোরিয়্যাল ও ইন্টারেকটিভ অ্যাসেসমেন্ট পুরোপুরি হার্ভার্ডের প্রতিটি অনক্যাম্পাস কোর্সের সাথে মানানসই। ছাত্রদের কোড কোয়ালিটির ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ফিডব্যাক দেয়ার জন্য তৈরি সফটওয়্যারটি অনলাইন ক্যাম্পাসের ছাত্রদের জন্য যেমন উপকারী, তেমনই অনক্যাম্পাস ছাত্রদের জন্যও। একইভাবে হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের ই. ফ্রান্সিস কুক এবং মার্সেলো পাগানো বায়োস্ট্যাটিসটিকস ও এপিডেমিওলজির ওপর একটি আদর্শমানের কোর্স ডেভেলপ করেছেন। এটি একটি ক্লাসরুম মডেলেরও উপযোগী। এ কোর্সে ছাত্রেরা লেকচার ও অন্যান্য কোর্স ম্যাটেরিয়্যাল শোনে অনলাইনে এবং ক্লাসে আসে সহপাঠী ও ইনস্ট্রাক্টরের সাথে সক্রিয় আলোচনার জন্য।’

‘ভিডিও, ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া ও অ্যাসেসমেন্টের নতুন নতুন মডেলের মতো ডিজিটাল রিসোর্সেরদের দ্রুত উদ্ভব আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার। আমাদের ভাবতে হবে– ছাত্রদের জন্য আমরা কী করতে পারি কিংবা করা উচিত। যেমন আমি যখন সেলুলার মেটাবলিজম বিষয়ে একটি অনলাইন কোর্স ডেভেলপ করি, তখন আমি ধরে নিয়েছিলাম অ্যানিমেশনের সাথে এমবেডেড ও সেলফ-পেসড অ্যাসেসমেন্ট যৌথভাবে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রন স্থানান্তরের জটিল বিষয়টি প্রচলিত ক্লাসের তুলনায় আরও কার্যকরভাবে জানা যাবে। কাজের ভারটা অপরিবর্তনীয় রেখে অ্যাসাইনমেন্ট পুনর্বিন্যাস করে অন্তর্ভুক্ত করা হয় রিডিং ও অনলাইন ম্যাটেরিয়্যাল। তা সত্ত্বেও আমি ক্লাসে ছাত্রদের সময় দিতাম। ইলেকট্রন স্থানান্তর মেটাবলিক পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য। অন্য কথায়, আমি ছাত্রদের সাথে সময় কাটাতাম তাদের চ্যালেঞ্জিং ধারণাগুলো বোঝানোর জন্য। এ ক্ষেত্রে একটি ক্লাসরুমের ছাত্রদের ফ্যাকাল্টি সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি কার্যকরভাবে আকৃষ্ট করে তোলা যাবে।’

‘উল্লিখিত সব চমৎকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হচ্ছে চাবিকাটি। কিন্তু আমরা এখনও জানি না, কী করে ত্বরান্বিত করতে পারি অন-ক্যাম্পাসের জন্য অনলাইন লার্নিংয়ের ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়নের বিপ্লব। এজন্য HarvardX-এর প্রতিটি কোর্স ও মডিউলের রয়েছে একটি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটেড কম্পোন্যান্ট। ‘হার্ভার্ডএক্স’ হচ্ছে হার্ভার্ডের একটি ইউনিভার্সিটি ওয়াইড ডিজিটাল এডুকেশন উদ্যোগ, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে edX-এর অংশগ্রহণ।’

১৫ জন শিক্ষার্থীকে ডাকা হলো, উইতুজি তাদের মধ্যে একজন। এরপর সে আবেদন করে তাকে লার্জার ক্লাসে নেয়ার জন্য, কার্যত যা হবে এমওওসি’র পূর্ণ কারিকুলামে ভর্তি।

ফল সেশন প্রোগ্রামে কেপলার ৫০টি স্লটের জন্য পেয়েছিল ২৬৯৬টি আবেদন। এদের মধ্যে ৬০০ শিক্ষার্থীকে একটি পরীক্ষায় ডাকা হয়। এর মধ্যে উইতুজিসহ ২০০ জনকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। এ ২০০ জনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কেপলার স্টাফের তত্ত্বাবধানে দলগত কর্মকাণ্ড তথা গ্রুপ অ্যাকটিভিটিজে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে এদের পার্সোন্যালিটি ট্রেইট বা ব্যক্তিগত প্রলক্ষণ– যেমন নেতৃত্বের যোগ্যতা, অন্যদের সাথে কাজ করার সক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। এসবের লক্ষ্য বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সবাইকে ক্লাসে একসাথে নিয়ে আসা। এসব ব্যক্তিগত প্রলক্ষণের বিবেচনায় এরা কেউ লাজুক, কেউ আমুদে, সৃজনশীল, বায়নাপ্রিয়, অজুহাতসন্ধানী কিংবা কেউ বিবেকবান। ঝুঁকিটা কিন্তু কম ছিল না। জিন এইমি মুতাবাজি নামে একজন প্রথমে ফল সেশনের জন্য চূড়ান্ত বাছাইয়ে টিকেনি। তার বাবাসহ বেশিরভাগ পুরুষ আত্মীয় গণহত্যার সময় নিহত হন। সে বাস করত তার মায়ের সাথে, যাকে এক পা টেনে টেনে চলতে হয়। একটি সিমেন্টের খাঁচা থেকে কয়লা কুড়িয়ে এনে তা বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হয়। তাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না।

মুতাবাজির প্রশ্ন– ‘কল্পনা করুন, যখন কেউ বিপদে পড়ে এবং তখন তাকে সাহায্য করার কেউ না থাকলে কী পরিস্থিতি দাঁড়ায়?’ আবার তারই জবাব– ‘শিক্ষা হচ্ছে একটি জাদুশক্তি, যা বিশ্বের দুয়ার খুলে দেয়, যদি আপনি নিজে শিক্ষিত হন। তখন আপনি যে পরিস্থিতিতেই বসবাস করবেন, তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।’

উইতুজি প্রথমে চেয়েছিল বিমানের পাইলট হবে। তবে এখন মনে করে, এর নাগাল সে পাবে না। অতএব এখন তার সম্ভাব্য পেশা ব্যাংকার। সে কেপলারের মাধ্যমে পড়তে পারবে বিজনেস ও ফিন্যান্স। তার কথা– ‘আমার জীবনযাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা। আমার বোনদের দেখাশোনার উপায়ও এ শিক্ষার মাঝে, আমাকে এদের প্রয়োজন।’

যারা এমওওসি নামের কোর্স নিয়েছে, তারা বিনামূল্যে কিগালিতে বসে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে যোগ দেবে। তাদের থাকা-খাওয়ার খরচও দেয়া হবে। জেনারেশন রুয়ান্ডার নির্বাহী পরিচালক জ্যামি হোডারি এক অনুমিত হিসাব দিয়ে বলেন, কারিকুলাম ডিজাইন ও ইভ্যালুয়েশনে প্রাথমিক খরচ ১ লাখ ডলার হবে। এ খরচের পর প্রতিবছর শিক্ষার্থীপিছু পড়ার খরচ পড়বে ২০০০ ডলার। তিনি আশা করেন, একসময় এ খরচ ১০০০ ডলারে নামিয়ে আনা যাবে। প্রাথমিকভাবে দেয়া হবে একটি অ্যাসোসিয়েট আর্টস ডিগ্রি, যাতে সাউদার্ন নিউ হ্যাম্পশায়ার ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে বিশেষ জোর দেয়া হবে বিজনেস স্টাডির ওপর। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে কাটিং এজ প্রোগ্রাম। ক্লাসে বেশি বেশি সময় না কাটিয়েও এ বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন সুপ্রমাণিত নানা ডিগ্রি প্রদান করছে। কেপলার পরিকল্পনা করছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রশাসন, কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ের ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি দিতে।

উইতুজির কিছু প্রশ্ন আছে অনলাইন উদ্যোগ নিয়ে। তবে সে এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, সে সুযোগ পাবে। এখানকার বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গরিব। এরা যখন এ ধরনের সুযোগ পায়, তখন এদের কাছে আর কোনো বিকল্প কিছু থাকে না। এমনটিই মনে করে উইতুজি।

## যেখানে এমওওসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বের সেরা সেরা কলেজ কোর্সগুলো বিশ্বের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চয় একটি আশা-জাগানিয়া বিষয়। আবার কেউ বলতে পারেন, এ হচ্ছে এমওওসি আন্দোলনের এক প্রতারণা। স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মিলে প্রতিষ্ঠিত Udacity আর Coursera-র মতো এমওওসি প্ল্যাটফরমের শীর্ষস্থানীয় লাভজনক কোম্পানিগুলো এবং এমআইআইটি ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত edX-এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য অ্যাডভান্স এডুকেশনের ক্লাস ও ভৌগোলিক সব বাধা দূর করার। Coursera-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড্যাফনি কোলার ২০১২ সালের জুনে দেয়া তার একটি TED লেকচারে দুনিয়া পাল্টে দেয়ার লক্ষ্যগুলো উল্লেখ করেন। এ লেকচার দেখানো হয় ১০ লাখ বারেরও বেশি। এই মহিলা সেদিন বলেছিলেন : MOOCs would 'establish education as a fundamental human right, where any one around the world with the ability and motivation could get the skills that they need to make a better life for themselves, their families and their countries.'

*তিনি তার একই লেকচারে আরও বলেছিলেন :* 'হতে পারে পরবর্তী কোনো আইনস্টাইন বা কোনো স্টিভ জবস আফ্রিকার কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করছে। আর আমরা যদি তাকে যথাযথ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারি, তারাই হয়তো নিয়ে আসবে পরবর্তী কোনো বড় ধরনের ধারণা, যা আমাদের পৃথিবীকে নিয়ে যাবে উন্নততর কোনো অবস্থানে।'

কেউ এ ধরনের লক্ষ্য নিয়ে কোনো বিতর্ক তুলতে পারে না। তারপরও যেসব শিক্ষাবিদ দূরশিক্ষণ ও অনলাইন লার্নিং নিয়ে কাজ করছেন, তাদের অভিমত– এমওওসি এভানজেলিস্টেরা তথা প্রচারকেরা তাদের নিজেদের ও তাদের পণ্য সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেন। এরা উল্লেখ করেন, এমওওসি আসার অনেক আগেই অনলাইন লার্নিং শুরু হয়েছিল। আর এমওওসি কখনও কখনও সবচেয়ে সেরা ও হালনাগাদ টিচিং মেথড অন্তর্ভুক্ত করে না। এরা আরও উল্লেখ করেন, বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সংযোগ নেই। আর এমওওসি'র জন্য যে দক্ষতা ও মটিভেশন দরকার, তা শুধু সেরা শিক্ষার্থীদেরই আছে। অনলাইন লার্নিং সম্পর্কিত কানাডীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শক টনি বেইটস বলেন : 'You will have to find a solution that actually fits the reality of the third world.' তিনি আরও বলেন, 'হ্যাঁ আগামী দিনে কনটেন্ট ফ্রি পাওয়া যাবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আসল প্রয়োজন সেই সার্ভিস, যা ইনস্ট্রাকটরেরা দিয়ে থাকেন। কীভাবে পড়াশোনা করতে হবে, তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ, মৌলিক ধারণা পেতে কী করতে হবে, আলোচনা ও উচ্চ পর্যায়ের ভাবনাচিন্তা– এসব ব্যাপারে সহায়তা আসতে হবে শিক্ষকের সাথে একজন ছাত্রের ও ইনস্ট্রাকটরের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।'

## 'ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত'

**পিটার নরভিগ,** *গুগলের রিসার্চ ডিরেক্টর ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ের লেখক*

'গত তিন দশক ধরে শিক্ষাবিদেরা জেনে আসছেন, ছাত্রেরা ভালো করে যখন তাদের 'ওয়ান-অন-ওয়ান টিউটরিং অ্যান্ড মাস্টারিং' দেয়া হয়। ছাত্রদের সফলতার জন্য বাবা-মা অভিভাবক ও সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনাও প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, এমওওসি কি বাতিল করে দেবে সাফল্যের এসব উপাদানগুলোকে? না, তা মোটেও নয়। আসলে ডিজিটাল টুলগুলো আমাদের সুযোগ করে দেবে আমাদের উপায়-অবলম্বনগুলোকে পার্সোনালাইজিংয়ের মাধ্যমে ব্যয়সাশ্রয়ী করে তুলতে।'

'আমি মনে করি সাফল্যের বিষয়টি আমি দুভাবেই শিখেছি। বছরের পর বছর ধরে সেবাস্টিয়ান থ্রুন ও আমি স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য স্কুলে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কোর্স পড়াচ্ছি। আমরা লেকচার দিচ্ছি, বাড়ির কাজ দিচ্ছি এবং সবাইকে একই সময়ে একই পরীক্ষায় বসাচ্ছি। প্রতি সেমিস্টারে ৫ থেকে ১০ শতাংশ ছাত্র নিয়মিত ক্লাসে গভীর আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষম হয়েছে। বাকিরা ছিল প্যাসিভ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। আমরা ভাবলাম, আমাদেরকে আরও উন্নততর উপায় বের করতে হবে। অতএব ২০১১ সালের ফল সেশনে আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করলাম। আমাদের প্রচলিত ক্লাসরুমের পাশাপাশি সৃষ্টি করলাম একটি অনলাইন কোর্স, যা সবার জন্য উন্মুক্ত। আমাদের প্রথম প্রচেষ্টায়ই এ কোর্সে অংশ নেয় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী– ১ লাখের মতো। এদের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করে ২৩ হাজার শিক্ষার্থী।

'নোবেল বিজয়ী হার্বার্ট সাইমনের একটি উদ্ধৃতি হচ্ছে : 'learning results from what the student does and thinks and only from what the student does and thinks'– হার্বার্ট সাইমনের এই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা students doing things-কে কেন্দ্র করে একটি কোর্স তৈরি করি এবং মাঝেমধ্যে এর ফিডব্যাক নিচ্ছি। আমাদের লেকচার খুবই স্বল্প সময়ের– দুই থেকে ছয় মিনিটের ভিডিও। এটি ডিজাইন করা হয়েছে পরবর্তী অনুশীলন করার লক্ষ্য মাথায় রেখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছে ভিডিওর মাধ্যমে গাণিতিক কৌশলে প্রয়োগের। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিল উন্মুক্ত প্রশ্ন, যা ছাত্রদের সুযোগ করে দেয় নিজের মতো করে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তা অনলাইন ফোরামের মাধ্যমে বিনিময় করার।'

'আমাদের স্কিম বা পরিকল্পটি কার্যকর শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণ হচ্ছে। টিউটরিং ও মোটিভেশনের ক্ষেত্রে তা উপকার বয়ে আনছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় তা প্রতিফলিত হয়েছে, সে কারণে বলব– যথাযথভাবে ডিজাইন করা অটোমেটেড ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং সিস্টেম শেখার সাফল্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। অনলাইনে লার্নিং টুল ঠিক তেমনই, যেমনই পাঠ্যবই একটি টুল। ছাত্র-শিক্ষক অনলাইন টুল কীভাবে কাজে লাগাবে, তার ওপরই মূলত নির্ভর করছে এর সাফল্যের মাত্রা।'

এ প্রেক্ষাপটেই এসেছে কেপলারের মতো এক্সপেরিমেন্ট : কম খরচের ইনস্ট্রাকটর দিয়ে বিশ্বের সেরা সেরা প্রফেসরের কনটেন্ট সংমিশ্রণ করে ব্যক্তিপর্যায়ে ছাত্রদের সহায়তা দেয়া ও ছাত্রদের প্রণোদিত করা। এ মডেলটি বিশেষ করে রুয়ান্ডার মতো দেশের জন্য উপযোগী, যেখানে ছাত্রদের ছোট্ট একটা অংশের রয়েছে কলেজ ডিগ্রি এবং সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেখানে আরও ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেও কলেজের চাহিদা পূরণ করা যাবে না। এখানে অনেক ছাত্র কলেজে যায় না। আমেরিকান প্রেক্ষাপটে এরা যেত প্রিন্সটনে।

যুক্তরাষ্ট্রেও আছে এমওওসির সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্কের ঝড়। আর বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কলেজ ডিগ্রির খরচের লাগাম টেনে ধরার বিষয়টি। কোলার তার লেকচারে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালের পর স্বাস্থ্যসেবার খরচের তুলনায় ছাত্রবেতন বেড়েছে দ্বিগুণ। তার মতে, এ সমস্যার সমাধান এমওওসি। এরপরও উন্নয়নশীল বিশ্বে আছে শিক্ষার মানের প্রশ্ন। সুযোগ-সুবিধা ও ইনস্ট্রাকশনের পর্যায় অনেক দেশে দুর্ভাগ্যজনক। আর কলেজ ডিগ্রি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিয়োগদাতাদের কাছে কোনো গুরুত্ব পায় না। উদাহরণ টেনে বলা যায়, রুয়ান্ডায় যেসব ছাত্র কমপিউটার কোর্স নিয়েছে, তাদের অনেকেরই কমপিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা খুবই কম। এটি এমন যে, আপনি সাঁতারের ওপর ডিগ্রি নিয়েছেন শুধু বই পড়ে, ▸

কিন্তু কখনই পানিতে নেমে নিজে সাঁতার দেননি। এ উদাহরণটি টেনেছেন মাইকেল বেজি, যিনি কিগালিতে কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছোট্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের সহযোগী পরিচালক।

এ বিষয়টি শুধু ছোট ছোট দেশের জন্যই সত্য নয়, সত্য ভারতের মতো বড় ও বিকাশমান শক্তিধর দেশের জন্যও। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে, কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে আসছে। ভারতে উঁচুসারির শিক্ষাবিদ বলে বিবেচিত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রফেসর অশোক ঝুনঝুনওয়ালা বলেন– ভারতে প্রচুর প্রকৌশল গ্র্যাজুয়েটও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যেখানে এক বছরে বেরিয়ে আসছে ৬ লাখ থেকে ৮ লাখ প্রকৌশলী, তাদের মাত্র ১০ শতাংশ মানসম্পন্ন।

'এসপায়ারিং মাইন্ড' নামে একটি কোম্পানি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্র্যাজুয়েটদের ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করে থাকে। এ কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও অপারেটিং অফিসার বরুণ আগরওয়াল বলেন– সমীক্ষা থেকে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। বেসিক কোডিংয়ের জন্য মাত্র ৭ শতাংশ কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড চাহিদা পূরণ করে। ২০১১ সালে ৫৫ হাজার ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটের ওপর একটি ব্যাপকভিত্তিক 'এমপ্লয়েবিলিটি টেস্ট' নেয়া হয়। এতে দেখা যায়, এদের ৪২ শতাংশই দশমিকের সংখ্যার গুণ ও ভাগ করতে জানেন না। এমনকি ২৫ শতংশেরও বেশি গ্র্যাজুয়েট ইংরেজিতে লেখা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল কারিকুলাম পড়ে বুঝতে পারেন না। আগরওয়াল ক্ষোভের সাথে বলেন– এটি সত্যিই দুঃখজনক। আমরা প্রচুর গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছি, কিন্তু তাদের ন্যূনতম পর্যায়ের মানও নেই।

এর জন্য অংশত দায়ী যথাযথ ইনস্ট্রাকশনের অভাব। অন্য কথায় 'পুওর ইনস্ট্রাকটর'। আগরওয়াল বলেন, 'ইনস্ট্রাকটরদের ভালো বেতন দেয়া হয় না। তাই এ পেশাতে কেউ আসতে চায় না। যেসব প্রকৌশলী ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পায় না, তারা যায় শিক্ষকতায়।' আরেকটি বিষয়, উচ্চশিক্ষা শুরুর আগে ছাত্রদের প্রস্তুতি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় অনেকের ইংরেজিতে যথাযথ দক্ষতা থাকে না, যেখানে ইনস্ট্রাকশনের ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে। ভারতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম কয়টির একটি। সেখানে ৬শ'রও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৩ হাজারেরও বেশি কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে ২ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী। তারপরও কলেজ-বয়েসী ভারতীয়দের ভর্তির হার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। ভারতে কলেজ-বয়েসী ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যেখানে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে ২৬ দশমিক ৮ ও ৯৪ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতে এ হার ৫০ শতাংশে তুলতে আরও ৩-৪ কোটি শিক্ষার্থীকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যেভাবে চলছি তাতে এ চাহিদা পূরণ হবে না। ভারত তা শুধু আশা করতে পারে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমে। এতে করে 'কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটি'– এ উভয় চাহিদাও মেটানো যাবে। বলে অভিমত 'মনিপাল গ্লোবাল এডুকেশন'-এর সাবেক প্রধান নির্বাহী আনন্দ সুদর্শনের। মনিপাল গ্লোবাল এডুকেশন পরিচালনা করে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪০টিরও বেশি অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

## এমওওসি : একটি দৈববর

আমরা যদি বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবি, তবে পরিস্থিতিটা ভারতের সাথে চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি মিল খুঁজে পাব, তবে উচ্চশিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতিটা ভারতের চেয়ে খারাপ বই ভালো হবে না। তাই ভারতের ক্ষেত্রে এ সমস্যার একটি সমাধান যদি হতে পারে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিক্ষা, তবে বাংলাদেশের জন্যও তা সত্যি। আর এ ক্ষেত্রে ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে এমওওসি হচ্ছে একটি সমাধান। কারও কারও মতে, এ ক্ষেত্রে এমওওসি হচ্ছে প্রয়োজনের মোক্ষম সময়ের পরম উপকারী একটি দৈববর বা গডসেন্ড।

**৬৬%**

ইউএস কলেজ প্রেসিডেন্টের অভিমত, অ্যাডাপটিভ লার্নিং ও টেস্টিং টেকনোলজি ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় উপায়

Coursera-র কোলার বলেন, 'ইন্ডিভিজ্যুয়াল লার্নার হিসেবে প্রচুর লোক আমাদের কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। অনেকে ই-মেইল ও অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমে আমাদেরকে জানাচ্ছেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা। এরা বলছেন, এ কোর্স তাদের জীবন পাল্টে দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা এমওওসি ছাড়া উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে পারত না। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।'

ভারতের যবলপুরের ১৭ বছর বয়েসী অমল ভাবের কথাই ধরা যাক। ১৬ বছর বয়সে সে এমআইটির এমওওসি কোর্সে ঢুকে। তার বিষয় সর্কিট অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস। তার বাবা একজন প্রকৌশলী। তার বাবার প্রকৌশল বিষয়ের বইপত্র ছোটবেলা থেকে গেঁটে সে মৌল বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পেরেছিল। মাধ্যমিক স্কুলে থাকা অবস্থায় সে প্রোগ্রামিংয়ের ওপর মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন অর্জন করে। শখের বশে কাজ করে ইলেকট্রনিকস নিয়েও। একজন হাইস্কুল সিনিয়র হিসেবে সে কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে এমওওসি'র সার্কিট অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস কোর্স। কিন্তু edX তাকে ফলোআপ কোর্স 'সিগন্যাল অ্যান্ড সিস্টেমস' দিতে ব্যর্থ হয়। তখন অমল ভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। তখন সে আরও দু'জন ছাত্রের সাথে মিলে অনলাইন ফোরামের যোগাযোগ করে এমআইটি'র ভিডিও টেপ ও লেকচার এবং অনলাইন ক্যুইজ ও সেই সাথে অমল ভাবের প্রণীত অন্যান্য ইন্টারেকটিভ উপকরণের ওপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব এমওওসি কোর্স ভার্সন তৈরির জন্য। অমল ভাবে জানায়, 'এটি আমার নিজের কোড। সবকিছুই আমার। মোটামুটি ১১০০ ছাত্র আমার এ কোর্সে অংশ নেয়। আমি আর আমার পরিবার খুবই আনন্দিত যে, আমার শহরের ছাত্ররা এই প্রথমবার এমআইটি'র আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স শেষ করতে যাচ্ছে।'

এ বিষয়টি আমরা দুইভাবে নিতে পারি। প্রথমত, এমআইটি এমওওসি মধ্যভারতের তরুণদের জন্য একটি চমৎকার সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এমওওসি কখনই প্রচলিত কোর্সগুলোকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। যেমন অমল ভাবের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এমআইটিতে পড়বে। যে কারণে অমল ভাবে এমআইটি ক্লাসরুমে যোগ দিতে চায় তা সুস্পষ্ট : স্টার্টারদের জন্য হার্ড সায়েন্স পড়াশোনা করা কঠিন। যেমন অমল ভাবে নিজেও চাইবে ল্যাবে হাতে-কলমে গবেষণার সুযোগ। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, অমল ভাবে অনলাইন কোর্সে পড়শোনা করে একটি এমআইটি ডিগ্রি পেতে পারে না, যে ডিগ্রি কর্মজীবন গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ ভারতীয় অমল ভাবের মতো যোগ্য না-ও হতে পারে। এ ছাড়া তার পরিবার থেকে সে একটি কমপিউটার ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট লাইনের সুযোগটিও পেয়েছিল। তার বাবা একজন প্রকৌশলী, যিনি চাইলে তাকে একটি প্রাইভেট মাধ্যমিক স্কুলেও পাঠাতে পারতেন। ইন্টারনেট পেনিট্রেশন পরিস্থিতিরও উন্নয়ন ঘটছে ভারতে। তবে ২০১১ সালেও দেখা গেছে মাত্র ১০ শতাংশ ভারতীয় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়। দেশটির অনেক এলাকায় এখনো নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। দেশটিতে মাথাপিছু গড় আয় ১৫০০ ডলারের নিচে। কোটি কোটি ভারতীয়ের জন্য কমপিউটার এখনও একটি দূরকল্পনীয় বিলাসিতা।

## শেষ কথা

রুয়ান্ডা ও ভারতের মতো দেশ যদি এমওওসি থেকে উপকৃত হতে পারে, তবে বাংলাদেশের জন্য সে সম্ভাবনা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সুখের কথা, বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহার ও ইন্টারনেট পেনিট্রেশনের হারও বেশ বাড়ছে। অতএব এমওওসি ব্যবহার করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানো যায় কি না, তা ভেবে দেখার উপযুক্ত সময় এটি। শিক্ষার মান বজায় রেখে শিক্ষার খরচ কমিয়ে আনা ও বেশি থেকে বেশি শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই কজ